প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online)
ISSN: 2321-9319 (Print)

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে দাম্পত্য অশান্তি ও বিবাহ বিচ্ছেদের প্রেক্ষিতে নারীজীবন

রূপশ্রী দেবনাথ

Abstract

Suchitra Bhattacharjee is one of the prominent Bengali litterateurs of recent time. Her writing focuses on contemporary social issues. She wrote many short stories, which are illuminated from different aspects of women's lives. Exploitations and sufferings of women regardless of their social or economic identities find a distinct voice in her writing. While she is famous for her writing on women's issues, she does not consider herself a feminist. She has illustrated various problems of women's lives through her writing. Marital turmoil is a important social issue of present time in our society. In her short stories, we can see that she focused on this. Sometimes traditional practices and customs of our society tied up woman's life in the dark. But in her short story, woman did not accept any kind of torture. The present paper tries to show woman's struggles in different aspects regarding their life and works in the context of the short story of Suchitra Bhattacharjee.

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের জগতে সুচিত্রা ভট্টাচার্য একটি জনপ্রিয় নাম। তিনি নিজেকে নারীবাদী লেখক হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও তাঁর গল্পে কিন্তু মেয়েদের অবিসংবাদিত প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ১৯৫০ সালে সাংবিধানিক সমানাধিকার লাভের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হবার পর আজ মেয়েরাও বিশ্বায়ন তথা মুক্ত অর্থনীতির সমান অংশীদার। পাল্টে যাওয়া সময়, সমাজ ও জীবনবোধের সঙ্গে আজ মেয়েরাও নিজেদের দ্রুতলয়ে বদলে নিচ্ছে। শিক্ষার সাথে সাথে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভের ফলস্বরূপ চোখ কান খোলে যাওয়াতে মেয়েরা চিরাচরিত প্রথা, রীতি-নীতির বিরুদ্ধে আজ প্রশ্নমুখর। অন্যায় অপমান সহ্য করে আসা অন্তঃপুরের নারীরা আজ যখন আর আপোস করতে কিংবা মানিয়ে নিতে চাইছে না, তখন টান পড়েছে পিতৃতন্ত্রের মূলে। নারীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের স্ফূরণ ঘটার ফলে পরিবারে, দাম্পত্য সম্পর্কে তুমুল অশান্তির সূত্রপাত। যার পরিণাম বিবাহ বিচ্ছে ।

আবার অনেক সময় পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা পরনারীর প্রতি আসক্তির কারণেও দাম্পত্য সম্পর্কে দেখা দেয় অশান্তির ঘনঘটা এবং শেষ পরিণতি ঘটে বিবাহ বিচ্ছেদে। সাম্প্রতিক সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদের শতকরা হার ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর একাধিক গল্পে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রসঙ্গটিকে নানা চরিত্র ও কাহিনির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিতে তিনি আলো ফেলেছেন। বিবাহ পূর্ববর্তী নারী জীবন খানিকটা নিশ্চিন্তের হলেও বিবাহ পরবর্তী জীবনে অনেক সময়েই তাকে মানিয়ে চলতে হয়। আশাপূর্ণা দেবী বলেছিলেন- *"মেয়েদের জীবনে তো জীবনভর ম্যানেজেরই কৌশল।"*[১] কিন্তু যখনই কোনো নারী আর মানিয়ে নিতে চায় না, তখন বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুহূর্তে স্বামী, শ্বশুর বাড়ি পর হয়ে যায়। অন্যদিকে মেয়ের বাবা-মাও এই বিচ্ছেদ চান না, শ্বশুরবাড়িতে কোনো মতে ঠিকে থাকাতেই যে

নারীজীবনের গৌরব। এমনটাই যে রীতি। কিন্তু সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পের নারীরা মেনে নেবার প্রশ্নে অনেক সময়ই ব্যতিক্রমী। আজকের মেয়েদের বিবিধ জীবন জটিলতার কথা আমরা তাঁর গল্পে পেয়ে যাই

আসলে আজ পর্যন্ত মেয়েদের কোনো নিজস্ব ঠিকানা নেই। হয় বাপের বাড়ি, নয় শ্বশুর বাড়ি অর্থাৎ পুরুষের ঠিকানায় সে আশ্রিতা প্রাণীমাত্র। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে অধিকাংশ নারী বিচ্ছেদ পরবর্তী জীবনে বাপের বাড়িতে অবস্থান করলেও অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে চায়নি। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরশীল হয়ে সন্তানসহ নিজের দায়িত্ব নিজেই পালন করে গেছে। *'অচেনা ত্রিভূজ', 'ভাতের গল্প' 'চোরকাটা', 'ঘৃণার চেয়ে বড়', 'দুই নারী', 'সাত বছর এগারো মাস আট দিন'* গল্পগুলোতে দাম্পত্য অশান্তি ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টিকে দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে গল্পগুলোতে আমরা বিচ্ছেদ পরবর্তী জীবনে যাবতীয় সমস্যার সমাধানে শক্ত হাতে এগিয়ে থাকা নারীদের দেখতে পাই। তারা প্রত্যেকেই চাপা ক্ষোভ, ক্রোধ অন্তরে সুপ্ত রেখে জীবনসমুদ্রে তরী নিয়ে ভেসে চলেছে। সেই তরী নিয়ে ভিড়তে চাইছে এক শক্ত, মজবুত তীরে। যেখানে সে পাবে পায়ের নীচে দৃঢ় অবলম্বন। ভঙ্গুর বালুচরের মতো যা তাকে আর তলিয়ে নিয়ে যাবে না। অন্য কারো আশ্রয়ে নয় বরং স্থায়ী ঠিকানার সন্ধানেই যেন আজ মেয়েরা পথযাত্রী।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর একাধিক গল্পে নারীর নিজস্ব সন্দর্ভের সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর লেখায় দেখি এতদিনের ঘোমটা টানা মেয়েগুলো ঘোমটা খসা নারীরূপে পথে বেড়িয়ে এসেছে। অনেক গল্পে নারী ঘর ছেড়েছে ঘর পাবার আশাতেই। আবার কখনো অস্ফুট স্বরে কখনো বা সোচ্চারে নারী তার প্রতিবাদ প্রকাশ করেছে। শুধুমাত্র গৃহকোণেই যে নারীর স্থান সীমাবদ্ধ নয়, প্রয়োজনে তারাও বাইরে বেড়িয়ে এসে কাজে যোগদান করতে পারে, এরূপ প্রমাণ অনেক আছে তাঁর গল্পে। নিছক প্রেয়সীত্বে কিংবা মাতৃত্বে নয়, বরং নারীজীবনের স্বার্থকতা রয়েছে নারীত্বে। সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠারও যে রদবদল হচ্ছে, তাঁর স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে।

বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কের বিষাক্ত ছোবল দাম্পত্য জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সেগুলো তাঁর একাধিক গল্পে উঠে এসেছে। *'অচেনা ত্রিভূজ'* গল্পে হিমাদ্রি রায়ের জীবন কাহিনির মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সংকটের চিত্র প্রতিফলিত হয়। কলেজ শিক্ষক হিমাদ্রি রায় এক ছাত্রীর প্রেমে পড়ে বউ বাচ্চা ফেলে চলে গিয়েছিলেন। সমাজ-সংসারকে কাঁচকলা দেখিয়ে লিভ-টুগেদার করতেন মেয়েটির সঙ্গে। দ্বিতীয় প্রেমে মত্ত হয়ে স্ত্রী ও সন্তানের সাধারণ দায়িত্বজ্ঞানটুকু তিনি হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী মল্লিকার মধ্যে আমরা আত্ম স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীকে দেখতে পাই। স্বামী যখন তাকে ফেলে অন্য নারীর হাত ধরে চলে যায় তখন সে চাকরি বাকরি কিছুই করত না। কিন্তু দেখা যায় সে স্বামীর আসায় বসে থাকেনি। আবার দুর্যোগের দিনে বাবা-মার কাছেও হাত পাতেনি। বরং সে *"...একাই লড়াই করে নিজের পায়ে দাঁড়াল। পুনেতেই একটা ছোট্ট ফার্মে যোগাড় করল চাকরি। তারপর নিজের উদ্যোগেই কম্পিউটার ট্রেনিং-ফেনিং নিয়ে আস্তে আস্তে বেশ প্রতিষ্টিত করে ফেলল নিজেকে।"*[২] মল্লিকার মধ্যে এক স্বনির্ভরশীল নারীকে পাওয়া যায়। সে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকেনি।

বিবাহ বিচ্ছেদ বা দাম্পত্য অশান্তিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তান। চৌদ্দ বছর পর হিমাদ্রি যখন ফেলে যাওয়া পুরনো সংসারে ফিরে আসতে চেয়েছে, আর মল্লিকাও যখন নারীর সহজাত প্রবৃত্তির বশে স্বামীকে ফিরিয়ে নিতে চায়, তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের ছেলে। হিমাদ্রির ছেলে আপাত ভদ্র ব্যবহার করলেও এতদিন পর আর পিতা হিসেবে তাঁকে সংসারে পেতে চায় না। কেননা *"...বাবা-মার ঝগড়ার কুৎসিত স্মৃতিটা এখনও তাকে তাড়া করে? হয়তো সে ভয় পাচ্ছে আবার সেই দৃশ্য যদি ফিরে আসে।"*[৩]

'ঘৃণার চেয়ে বড়' গল্পে স্বামী পরিত্যক্তা অরুণা অত্যন্ত কষ্ট করে কন্যা তুলিকে বড় করে তুলেছে। তুলি এখন কলেজে পড়ে। অরুণা অসহায় অবস্থা থেকে নিজের মা ও মেয়েকে নিয়ে উঠে দাড়িয়েছে। যখন অরুণার স্বামী যৌবনের অহংকারে মেজাজ ও দাপটের জোড়ে স্ত্রী ও কন্যাকে ফেলে যায়, তখন তুলির বয়স *"সাড়ে তিন কী চার সবে।"*[৪] অরুণাকে তখন *"ঝুরঝুরে ধ্বংসস্তূপ থেকে কী কষ্টেই না মাথা তুলতে হয়েছে একটু একটু করে। ...ট্রেনি নার্স থেকে সিনিয়র সিস্টার। যৌবন থেকে যৌবনপ্রাপ্ত।"*[৫] আজ এত বছর পর যৌবন, মেজাজ, দাপট সমস্ত কিছু যখন হারিয়ে গেছে, তখন লোকটা আবার অরুণার দ্বারে এসে উঠেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে অদম্য মদের নেশা। রোজ টাকা চাইতে আসে অরুণার কাছে। মেয়ে তুলির মনে পিতার

অসহায়তা দেখে মায়া জেগে উঠলেও পরক্ষণেই মনে পড়ে -*"মা ঠিকই বলে। লম্পট, চরিত্রহীন একটা। নিজের ফূর্তির জন্য বউ মেয়েকে অসহায় ফেলে চলে গিয়েছিল।"*[৬]

অরুণার অতি কষ্টে গুছিয়ে ওঠা সংসারে লোকটির হঠাৎ আগমন আশান্তির ঝড় বয়ে আনে। অরুণার মনে তার স্বামীর প্রতি রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ, হিংসা, যন্ত্রণা মিশ্রিত অদ্ভুত একটা অনুভূতি জেগে ওঠে, যার জন্য সে লোকটির প্রতি কখনো নিষ্ঠুর আচরণ করে আবার কখনো দু'পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দেয়। কিন্তু এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য মেয়ে তুলির কাছ থেকেও অরুণাকে আঘাত পেতে হয়। স্বামী ফেলে যাবার পর মেয়ের দায়িত্ব পালনে যে ভূমিকা নিয়েছে অরুণা, প্রতিদানে সে কতটা মূল্য পেয়েছে? মেয়ের কাছ থেকে সন্দেহ অপবাদ আর কি? তুলি মাকে বলেছে- *"শুধু বাবার জন্য নয়। তোমার জন্যও চারদিকে মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে।...তুমি আসলে বাঁচতে দিতে চাওনি লোকটাকে।"*[৭] এভাবেই মেয়েরা সমাজ সংসারের কাছে উপযুক্ত মূল্য পায় না।

অবশেষে একদিন পয়সার জন্য হন্যে মানুষটা যখন অরুণার দরজায় আসে তখন অরুণার সমস্ত রাগ, ক্রোধ ক্ষোভ যন্ত্রণা লোকটির উপর ফেটে পড়ে। দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর যার জন্য অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, সে লোকটি যখন পুনরায় তার আগমনের মাধ্যমে যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে, তখন অরুণার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত মা মেয়ের কথা কাটাকাটিতে রাগের মাথায় অরুণা তার শাঁখা ও লোহা ভেঙে ফেলেছে আর মুছে ফেলেছে সিঁদুর। কিন্তু গল্পের শেষে থেকে যায় আসল চমক। নারীমন অবচেতনে সবসময়ই স্বামী-সন্তান নিয়ে একটি সুন্দর গৃহকোণের স্বপ্ন লালন করে চলে। হয়তো অনেক সময়ই সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়না। চৌদ্দ বছর আগে অরুণার সে স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু লোকটির আগমনে সেই স্বপ্ন যেন পুনরায় মাথা তুলতে চাইছে। আর সেজন্যই মিথ্যা আবরণে ঢাকতে গিয়ে অরুণা লোকটির সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। এ যেন নিজের কাছেই নিজেকে লুকানোর প্রয়াস। তাই গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই অরুণা তার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ভাঙা শাঁখার টুকরো কুড়িয়ে তুলে নিচ্ছে নর্দমা থেকে -*"ঘেঁটে ঘেঁটে কাঁদামাখা শাঁখার টুকরো তুলল একটা। লম্বা নর্দমা হাতড়ে ধীরে ধীরে সব কটা ভাঙা অংশ তুলে বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে রেখেছে প্রাণপণে ... একা একা। শুধুই শাঁখার টুকরো। লোহা। সাজের জিনিস। সংস্কার। কক্ষনো না।"*[৮]

'ভাতের গল্প' গল্পে লেখিকা অসাধারণ নৈপুণ্যে একজন মুসলমান নারীর জীবন বাস্তবতাকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। স্বামী পরিত্যক্ত অছিরন চার বছর ধরে শহরের বাসায় বাসায় কাজ করে কোনমতে মেয়ে শাকিলাকে নিয়ে বেঁচে আছে। সে শিক্ষিত নয়, রূপের গৌরব বা অর্থের গরিমাও তাঁর নেই। কিন্তু আছে কন্যা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, যার জন্য অসুস্থ শরীরেও সে কাজে বেরোয়। অছিরনের ভাবনার সূত্রে জানা যায়- *"শাকিলার বাপ যখন অছিরনকে তালাক দেয়, মেয়েটা তখন এতটুকুন। হাঁটতে সবে শিখেছে কি শেখে নি। তেলকালো মুখে ফোলা ফোলা গাল। এক মাথা গুঁড়ি গুঁড়ি চুল। কথায় কথায় হেসে ওঠে কলকল করে। অমন ফুলের মতো মেয়েটাকে ফেলেও কেমন চলে গেল মানুষটা।"*[৯] স্বামী গফুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার ক্ষেত্রে অছিরনের কোনো দোষ না থাকলেও গফুরের কিন্তু গুণ ছিল অনেক। সে গুণ হল স্বেচ্ছাচারী হবার গুণ। অনেক পুরুষই সুযোগ পেলে এই গুণের অধিকারী হতে পারেন অনায়াসেই, আর বিশেষ করে মুসলমান সমাজের পুরুষের তো এই গুণের কমতি হয় না। ফলত দেখা যায় গফুর বিনা বাধায় স্ত্রী কন্যাকে ত্যাগ করে অন্য নারীর হাত ধরে বেড়িয়ে যায়। একবার ফিরেও তাকায় নি। এই গল্পের অছিরন মুসলমান সমাজের তালাক প্রথাইয় বলি। খুব বেশিদিন সে স্বামীর ঘর করতে পারেনি। অছিরনের ভাবনায় গফুর চরিত্র তথা পুরুষ চরিত্রের স্বরূপ ধরা পড়েছে – *"পুরুষ মানুষের বুকের খাঁচায় মন বলে কিছু থাকে না, দেহ-সবটাই দেহ। নতুন বিবি অছিরন বাসী হতেই অন্য দেহ টানল লোকটাকে।"*[১০] অছিরন ছাড়াও আরও একাধিক নারীর সঙ্গে গফুরের সম্পর্ক। আর সেজন্যই *"গোটা পুরুষ জাতটাকেই এখন ঘেন্না করে অছিরন।"*[১১] অছিরনের জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গেছে, মানসিক আর্থিক সকল দিক থেকেই সে বিধস্ত। কিন্তু তবুও কন্যাকে নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই সে চালিয়ে গেছে। কন্যার অবুঝ আবদারে অসুস্থ শরীরেও অছিরনের মুখে হাসি জেগে ওঠে। মেয়ের ভাত খাওয়ার ইচ্ছা পূরণের জন্য অসুস্থ শরীর নিয়ে কাজে বেরোয়। দরিদ্র সংসারেও সে স্থায়ী হবার, টিকে থাকার সার্বিক প্রয়াস চালিয়ে যায়।

'দুই নারী' গল্পে একই পুরুষকে অবলম্বন করে দুটি নারী-জীবনের আবর্তনের চিত্র উঠে এসেছে। লেখিকার ভাষায়- *"এক অর্থে দু'জনেই তো পৃথক পৃথক দুটো পরগাছা মাত্র। সঞ্জয়ের অর্থে লালিত। সঞ্জয়ের তৃষ্ণায় জারিত।"*[১২] সঞ্জয়কে কেন্দ্র করে অতসী ও চন্দ্রার জীবনের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। এই গল্পে সঞ্জয় ঘরে স্ত্রী অতসী ও ছেলে মেয়েকে রেখে অফিসে নতুন চাকরি করতে আসা চন্দ্রার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে। কাঁচার জন্য কাপড় নিতে গিয়ে সঞ্জয়ের জামার পকেটে স্ত্রী অতসী আবিষ্কার করে একটি ছবি। কিন্তু *"ছবিটি কার গো?"*[১৩] এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সঞ্জয়ের বক্তব্যে যে ঝাঁজ বেড়িয়েছে, তাতে মনে হয় অতসীই অপরাধী। কেননা স্বামী যাই করুক না কেন তাকে প্রশ্ন করার অধিকার কোনো স্ত্রীর নেই। বরং সঞ্জয় উল্টে অতসীকে শাসিয়েছে *"... তুমি আমার জামা প্যান্ট ঘাঁটো নাকি আজকাল? আমাকে তুমি কি জেরা করছ?"*[১৪] চন্দ্রা ও সঞ্জয়ের গোপন সম্পর্কের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে গেলে অতসী মূহুর্তের জন্যও শান্তিতে দিন কাটায়নি। সে ভাবতে থাকে *"... দশ বছরের বিবাহিত জীবন একদিনের ঝড়েই ওভাবে তছনছ হয়ে যাবে কে জানত?"*[১৫] চন্দ্রার অদৃশ্য উপস্থিতি প্রতি মূহুর্তে বিপন্ন করে তুলতো অতসীর অস্তিত্বকে। তার দিনগুলি কেটেছিল তীব্র অপমান আর যন্ত্রণায়।

সঞ্জয়ের কাণ্ডজ্ঞানহীন সীদ্ধান্তের জন্য অতসীর পাশাপাশি চন্দ্রার জীবনও তছনছ হয়ে যায়। অতসীর অবস্থা কিছুটা হলেও ভালো ছিল, কেননা সঞ্জয়ের স্ত্রী হিসেবে তার একটা সামাজিক স্বীকৃতি আছে। কিন্তু চন্দ্রা কখনো সঞ্জয়ের স্ত্রী হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। চন্দ্রার সাথে সঞ্জয়ের সম্পর্কের ফলস্বরূপ তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। কন্যা জন্মের পরই সঞ্জয় চন্দ্রাকে জোর করে চাকরি ছাড়িয়ে দিয়েছিল। সঞ্জয় যতদিন বেঁচেছিল সে সময় চন্দ্রাকে আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর এই নারীকে অর্থ কষ্টের পাশাপাশি অবৈধ সম্পর্কের ভয় ভীতি ও যন্ত্রণা নিয়ে নিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছিল।

এ গল্পে সঞ্জয়ের কর্তৃত্বেই অতসী ও চন্দ্রার জীবন আবর্তিত হয়েছে। সে তার নিজের ইচ্ছে মতো দুই নারীর জীবন নিয়ে খেলা করেছে, কিন্তু কাউকেই শান্তি দিতে পারেনি। আর তাই সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর- *"স্বামীর নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে কান্না আসতে চাইলেও কিছুতেই কাঁদতে পারেনি অতসী। পনেরো বছরের জমাট অভিমান তার সমস্ত জাগতিক অনুভূতিগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দিয়েছিল।"*[১৬]

'চোরকাটা' গল্পটি শুরু হয়েছে অঙ্গনা ও দেবরাজের রেজিস্ট্রি ম্যারেজের ঘটনা দিয়ে। গল্পের কাহিনি এগিয়ে গেলে জানা যায় অঙ্গনার দ্বিতীয় বিয়ে এটি। তার আগে কৌশিকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু *"সাড়ে তিন বছরের মাথায় জোড় ভেঙ্গে খান খান।"*[১৭] সকলের আশীর্বাদ নিয়ে কৌশিকের সঙ্গে অঙ্গনার বিয়ে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মেয়ে টুকটুককে নিয়ে অঙ্গনা যখন কৌশিকের বাড়ি ছেড়ে চলে আসে তখন মেয়ের বয়স দুইয়েরও কম ।

দেবরাজের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ের মুহূর্তে ঘুরে ফিরে প্রথম বিয়ের প্রতিটা স্মৃতি অবিরত যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে অঙ্গনাকে আর সেই সূত্রেই উঠে আসে অঙ্গনা ও তার প্রথম স্বামী কৌশিকের সম্পর্কের স্বরূপ। অঙ্গনা ভাবে– *"কৌশিক যা ইগোয়িস্টি।"*[১৮] কৌশিক সবসময়ই তাকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দামই ছিলনা তার কাছে । তাই প্রথম বিয়ের স্মৃতি কিংবা কৌশিকের সঙ্গে কাটানো সময়গুলি অঙ্গনাকে বার বার আঘাত দেয়, আহত করে। দেবরাজের সঙ্গে ঘুরতে বেড়িয়ে তাই অঙ্গনার মনে হয়েছে-*"স্বপ্নেও এরকমটা ঘটলে বোধ হয় তুলকালাম করত কৌশিক। চাবি আলমারিতে ঝুলছে কেন। ইস্ত্রি করা জামাকাপড় কেন গুনে রিসিভ করনি। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেন নিউজপেপারের লোকটাকে পে করলে। উফ হিসেব আর হিসেব।"*[১৯] অঙ্গনার স্মৃতিতে কৌশিকের যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে তাকে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক বলেই মনে হয়। উচ্চশিক্ষিত হলেও পিতৃতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা তার মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান। স্ত্রীর মনকে বোঝার কিংবা স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোনো মূল্য দেবার মানসিকতা তার ছিল না।

অন্যদিকে অঙ্গনা স্বাধীনচেতা, স্বনির্ভর নারী। সে চাকরি করে। পিতা-মাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে নিজেই দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয়। এমন একজনকে জীবন সঙ্গী হিসেবে বাছাই করে যে কিনা তার মেয়ে টুকটুককেও গ্রহণ করতে রাজী। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র অঙ্গনার মধ্যে এক স্বাধীনচেতা নারীকে পাওয়া যায়। সে জীবন থেকে একবার নিষ্ঠুর শিক্ষা পেয়েছে। ফলে সে আর কার ভরসায় না থেকে নিজেই খুঁজে নিয়েছে নিজের চলার পথ। দেবরাজের পরিবার এই বিয়েতে পূর্ণ সম্মতি না দিলেও অঙ্গনা সেজন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে নি। তার গলার স্বর অনেক বলিষ্ঠ। গল্পের নামকরণে গল্পকার চমৎকার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি

করেছেন। পুরনো সম্পর্কের নানা যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি তার মনে চোরকাটার মত বিধে আছে। আর আছে বলেই হয়ত বা সে এতদূর এগিয়ে আসতে পেরেছে।

'সাতবছর এগারো মাস আটদিন' গল্পটি শুরু হয়েছে স্বামী স্ত্রীর মিউচুয়েল ডিভোর্সের চিত্র দিয়ে। বিয়ের সাত বছর এগারো মাস আট দিন পর তারা উকিলের কাছে যায় আইনত বিচ্ছেদের স্বীকৃতি লাভের জন্য। যদিও উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে আরও কিছুদিন আগেই, মায়ের ভূমিকা যথাযথ পালন হচ্ছিল না বলে স্বামী সংসার ছেড়ে আসতে হয়েছিল সুদষ্ণাকে। চাকরি, সংসার আর সন্তান পালনের দায়িত্ব একসাথে পালন করতে গেলে কীভাবে মার খেতে হয় মেয়েদের, সুদষ্ণার ভেতর দিয়ে তাই যেন দেখাতে চেয়েছেন। গল্পটিতে সুদেষ্ণা ও চন্দনের দাম্পত্য সমস্যার ছবি সাদা কালো রঙে আঁকা হয়েছে। মেয়ে সায়ন্তনীর জন্মের পর তার দায়িত্ব পালনের জন্য চন্দন যখন সুদষ্ণাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। সুদেষ্ণা পরিবারের লোকের কাছেই কন্যাকে রেখে কাজে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বেঁকে বসে চন্দন। তার বক্তব্য- *"তুমি আজ মেয়ে ফেলে কিছুতেই কাজে যেতে পারবে না। ... চুলোয় যাক তোমার চাকরি।"*[২০] সন্তানের সমস্ত দায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মা বাবা দুজনেই সমান অংশীদার। কিন্তু এই সমাজের একটা অলিখিত নিয়মে সন্তানের ছোট বয়সে মাকেই অধিকাংশ দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেজন্য কত মেয়েকেই যে ম্যানেজ করে চলতে হয় তা শুধু একজন মেয়েই জানে। এই গল্পেও দেখি, সুদেষ্ণা যখন চন্দনকে মেয়ের প্রতি তার দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রয়োজনে একদিন বাড়িতে থেকে যাবার কথা বলে, তখন চন্দনের মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসে নারীর প্রতি চিরন্তন পুরুষ সুলভ ব্যঙ্গ- *"চমৎকার? তোমার জন্য আমি অফিস কামাই করব?"*[২১] তার এই বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে যে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব শুধু মায়েরই। সন্তানের জন্য বাড়িতে থাকা যেন স্ত্রীর জন্য থাকা, স্ত্রীর কাজ করা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুদেষ্ণা যখন আর মানিয়ে নিতে না পেরে মেয়েকে নিয়ে স্বামীর ঘর ছাড়তে চাইল তখন- *"প্রচণ্ড শব্দে ঠাস করে চড় পড়ল একটা।"*[২২] এটাই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। সমাজ সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকাকে প্রসারিত করেছে ঠিকই কিন্তু অধিকার ফলানোর সময় পিতার অধিকার সর্বাগ্রে। সমাজ সংসারের এই নিষ্ঠুর বাস্তব দিকটি সুদক্ষ শিল্পীর মতো এই গল্পে তিনি তুলে ধরেছেন।

আলোচ্য প্রতিটি গল্পেই পুরুষ নারীকে মানুষ না ভেবে মেয়েমানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা না ভেবে সেই পরিসরের প্রেক্ষিতে কখনো তাকে আদেশ দিয়েছে, দয়া করেছে, করুণা করেছে, কখনো বা চালিয়েছে স্বেচ্ছাচার। কাহিনি ভিন্ন সমস্যা ভিন্ন হলেও আলোচ্য গল্পের প্রতিটি নারীই যেন কোন না কোনভাবে একইরকম। তাদের প্রত্যেকেরই দাম্পত্যজীবন সুখৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ নয়, বরং প্রতিকূল। সুতপা ভট্টাচার্য বলেছিলেন- *"ঘর মেয়েদের সীমাস্বর্গ, কিন্তু ঘরের পরিসরের নিয়ন্ত্রণ করেন কর্তাই, তাঁরই ইচ্ছায় পরিসর ভাঙে-গড়ে।"*[২৩] আলোচ্য প্রতিটি গল্প সম্পর্কেই উক্তিটি প্রযোজ্য। প্রতিটি নারীই স্বামীর দ্বারা অবহেলিত হয়েছে, কেউ বা পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় এদের মধ্য থেকেই দু'একজন আপন সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা এই প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে। সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও আবার নতুনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। প্রতিটি নারীই বেঁচে থাকার, ভালো থাকার বিকল্প রাস্তা খুঁজে নিতে চেয়েছে। আর এখানেই তাদের জয়। এখানেই তারা সম্পূর্ণ।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১। চৌধুরী শম্পা, নব্বই এর মধ্যবিত্ত ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য-র গল্প, [সামন্ত সুবল (সম্পাদক), বাংলা গল্প ও গল্পকার], পৃ-১০৫ ।

২। ভট্টাচার্য সুচিত্রা, আরো পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, অচেনা ত্রিভূজ, পৃ- ১৭১ ।

৩। ঐ, পৃ- ১৭৪ ।

৪। ঐ, ঘৃণার চেয়ে বড়, পৃ-১৮৪ ।

৫। ঐ, পৃ- ১৮৪-১৮৫ ।

৬। ঐ, পৃ-১৮৬ ।

৭। ঐ, পৃ-১৮৮ ।
৮। ঐ, পৃ-১৯০ ।
৯। ঐ, ভাতের গল্প, পৃ-২৬৮ ।
১০। ঐ, পৃ-২৬৮ ।
১১। ঐ, পৃ-২৬৮ ।
১২। ঐ, দুই নারী, পৃ-৪০৮ ।
১৩। ঐ, পৃ-৪০৬ ।
১৪। ঐ, পৃ-৪০৬ ।
১৫। ঐ, পৃ-৪০৬ ।
১৬। ঐ, পৃ-৪০৩ ।
১৭। ঐ, চোর কাটা, পৃ-১৯৯ ।
১৮। ঐ, পৃ-২০৪ ।
১৯। ঐ, পৃ-২০৬ ।
২০। ঐ, পৃ-৭৬ ।
২১। ঐ, পৃ-৭৬ ।
২২। ঐ, পৃ-৭৭ ।
২৩। ভট্টাচার্য সুতপা, মেয়েদের লেখালেখি, পৃ-১০২ ।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

১) ভট্টাচার্য সুতপা, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪ ।
২) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, আরো পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, সাহিত্যম্, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৩ ।
৩) সামন্ত সুবল (সম্পাদক), বাংলা গল্প ও গল্পকার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭ ।